PRANTIK GABESHANA PATRIKA
MULTIDISCIPLINARY-MULTILINGUAL-PEER REVIEWED-REFERRED-BI-ANNUAL DIGITAL RESEARCH JOURNAL
WEBSITE: SANTINIKETANSAHITYAPATH.ORG.IN
VOLUME-1 ISSUE-1 JULY 2022

প্রবহমান বাংলা সাহিত্যে সময়চেতনা : ব্যক্তি ও সমষ্টির দ্বন্দ্ব : প্রেক্ষিত লোকসাহিত্য

ড. মিলনকান্তি বিশ্বাস

LINK: https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2022/12/বাংলা-সাহিত্যে-সময়-চেতনা-প্রেক্ষিত-লোকসাহিত্য-final-2.pdf

সারসংক্ষেপ: প্রবহমান বাংলা সাহিত্যের ধারায় সেই প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকেই ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির দ্বন্দ্বকে আমরা লক্ষ করি। এবং আধুনিক যুগ রচিত সাহিত্যের নানা শাখায় এই দ্বন্দ্বের নানা মাত্রাও দেখি। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখা, যেমন লোককথা, ছড়া, প্রবাদ, লোকসংগীত, গীতিকা প্রভৃতি ধারায় কীভাবে ব্যক্তি ও সমষ্টির দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে , তা নিয়ে এই বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ।

সূচক শব্দ: ব্যক্তি, সমষ্টি, দ্বন্দ্ব, লোকসাহিত্য, লোককথা, ছড়া, প্রবাদ, লোকসংগীত, গীতিকা।

পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন। এই বিশ্বমহামারীর ধ্বংসলীলার মধ্যে বসে, সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার জন্য যে মানসিক স্থিরতার প্রয়োজোন সেটা হয়তো এখন নেই। কিন্তু আমরা তো 'তিমির বিলাসী নই', 'আমরা তিমির বিনাশী হতে চাই' বলেই আমাদের এই পথ চলা।

প্রবন্ধের বিষয় 'প্রবহমান বাংলা সাহিত্যে সময়চেতনা : ব্যক্তি ও সমষ্টির দ্বন্দ্ব : প্রেক্ষিত লোকসাহিত্য'। প্রবহমান বাংলা সাহিত্যের ধারায় সেই প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকেই ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির দ্বন্দ্বকে আমরা সুন্দরভাবে লক্ষ করতে পারি। এবং আধুনিক যুগে রচিত সাহিত্যের নানা শাখায় এই দ্বন্দ্বের নানা মাত্রা লক্ষ দেখি। যেমন মনসামঙ্গাল কাব্যে চাঁদ ও মনসার দ্বন্দ্ব অসম শক্তির দ্বন্দ্ব। চাঁদ এখানে সমগ্র বণিক তথা সম্ভ্রান্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। মনসা অরণ্য জাতির দ্বারা পূজিতা অস্পৃশ্যা দেবী। যাঁকে ছুঁলে স্নান করতে হয়। চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যেও বনের পশুগণের উপর কালকেতুর অত্যাচার সেই ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির দ্বন্দ্বকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কালকেতু যদিও ব্যাধ সম্প্রদায়ের সন্তান তথাপি এই কাব্যে সে পশুদের দুঃখের কারণ হয়ে উঠেছে। বনের পশুদের জীবনে প্রবল সংকট নেমে এসেছে। রূপকের অন্তরালে বলা হয়েছে অত্যাচারী ও অত্যাচারিত শ্রেণির কথা।

আধুনিক যুগের সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সময়ের প্রেক্ষিতে বিচার করলে ব্যক্তি ও সমষ্টির দ্বন্দ্বের নানা মাত্রা লক্ষ করা যায়। বাংলা সাহিত্য বলতে আমরা লিখিত এবং অলিখিত উভয় সাহিত্যকে বুঝে থাকি। একালের পরিভাষায় বললে বলা যায় পরিশীলিত সাহিত্য ও লোকসাহিত্য। বাংলার পরিশীলিত সাহিত্যে সময় চেতনা এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির দ্বন্দ্ব দেখানো যত সহজ লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে ততখানি দুরূহ। তার কারণ লোকসাহিত্যের অধিকাংশ ক্ষেত্রে রচনার সময় এবং রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না। ফলে নির্দিষ্ট

করে বলা সম্ভব নয় যে, এই ছড়াটি বা প্রবাদটি বা লোকসংগীতটি এই সময়ে রচিত। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখা, যেমন লোককথা, ছড়া, প্রবাদ, লোকসংগীত, গীতিকা প্রভৃতি ধারা থেকে একটি দুটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি আলোকপাত করার যেতে পারে।

এক : লোককথা

আমাদের সভ্যতার ইতিহাস যদি খেয়াল করি তাহলে দেখব আমাদের আদিম সভ্যতায় (Primitive Stage) মানুষ বনে জঙ্গলে গুহায় বসবাস করত। এই বসবাস করতে গিয়ে বন্য জীবজন্তুর সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হতো তাদের। সময়ের অগ্রগতিতে সেই আদিম সংস্কৃতি (Primitive Culture) দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক, লোকসংস্কৃতি বা Folk Culture; দুই, শিষ্ট সংস্কৃতি বা পরিশীলিত সংস্কৃতি বা Elite Culture। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার মধ্যে অন্যতম হল মৌখিক সাহিত্যের ধারা বা লোকসাহিত্যের ধারা বা Folk literature। এই লোকসাহিত্যের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন শাখা হল লোককথা বা Animal Tale। মানুষ যখন কথা বলতে শিখেছে তখন তাদের জীবনের নানা অভিজ্ঞতাকে গল্পের আকারে প্রকাশ করেছে।

২

লোককথারও অন্যতম প্রশাখা হলো পশুকথা বা উপকথা বা Animal Tale। একটি উল্লেখযোগ্য পশুকথা হলো **সিংহ ও খরগোশের গল্প**।

গল্পটি হলো এইরকম — এক বনে এক সিংহ ছিল। সে ছিল ওই বনের রাজা। অন্য পশুরা ছিল তার অধীন। খিদে পেলে সে অন্য পশুদের ধরে ধরে খেত। একদিন বনের সব পশুরা একটি সভা করল। সভায় সিদ্ধান্ত হলো, সব্বাইকে যখন মরতে হবে তখন পালা করে এক এক দিন এক এক জন সিংহের কাছে যাবে। সিংহ তাকে ধরে খাবে।

একদিন এক খরগোশের পালা এলো। ছোট্টো খরগোশ ভাবল, 'এমনি মরবো ওমনি মরবো। বনটা একটু ঘুরে দেখে যাই।' সারাদিন বনে বনে ঘুরে বিকেলে সিংহের কাছে হাজির হলো। এদিকে খিদেয় সিংহের পেট চোঁ চোঁ করছে। খরগোশকে দেখার পর সিংহ গেল প্রচণ্ড রেগে। রাগের কারণ তার পেটের এক কোণও ভরবে না খরগোশকে খেয়ে।

খরগোশ তখন বলল, 'মহারাজ এই বনের মধ্যে আর এক মহারাজ এসেছে। সেইই আমাকে আটকে রেখেছিল। অনেক অনুনয় বিনয় করে তার থেকে ছাড়া পেয়ে তবে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

সিংহ খরগোশের মুখে এই কথা শোনার পর প্রবল রেগে গেল। রেগে বলল 'কী আমার রাজ্যে অন্য রাজার প্রবেশ! আমাকে দেখাতে পারবি?'

খরগোশ বলল — 'হ্যাঁ মহারাজ, চলুন, দেখাতে পারব'।

খরগোশ সিংহকে একটা কুয়োর কাছে নিয়ে গিয়ে দূর থেকে দেখিয়ে বলল — 'মহারাজ, ওই কুয়োর মধ্যে সেই মহারাজ আছে।'

সিংহ কুয়োর ধারে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল কুয়োর ভেতরে ঠিক তারই মতো একটি সিংহ আছে। তারই মতো সেও গর্জন করছে। শেষে রাগ সামলাতে না পেরে সিংহ কুয়োর মধ্যে ঝাঁপ দিল এবং জলে ডুবে মারা গেল।

গল্পটি রূপকাশ্রিত। আমরা এই গল্পকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আলোকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেই পারি। আমরা জানি ১৮৪৮ সালে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ প্রকাশ করেন 'কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টো' বা 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার'। কিন্তু অনেক আগে থেকেই গল্পগুলি আমাদের সমাজে প্রবহমান। এই গল্পগুলির মধ্যে আমাদের সমাজের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অভাব-বেদনা, সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে এই সিংহ আসলে কে! 'সিংহ' হলো আমাদের সমাজের অত্যাচারী

সামন্ততান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী সমাজের প্রতিনিধি এবং বনের পশুরা এখানে অত্যাচারিত, শোষিত, শ্রমিক সমাজের প্রতিনিধি। পুঁজিবাদী শক্তির সঙ্গে শোষিত, অত্যাচারিত শ্রমিক সমাজের দ্বন্দ্বকে এভাবে লোকায়ত মানুষ গল্পের মধ্যে দিয়ে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। লোকায়ত মানুষ বাস্তবে হয়তো ওই শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে অক্ষম কিন্তু তাঁরা যখন সাহিত্য রচনা করেন কিংবা গল্প বলেন তখন সেই গল্পে বা সাহিত্যে অত্যাচারী শক্তিকে পরাস্ত করে হৃদয়ে গভীর প্রশান্তি লাভ করছেন। তাঁদের অপূর্ণ ইচ্ছের প্রকাশ হয়তো এভাবে ঘটেছে। এখানে শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্বের পরিচয় পাই এই গল্পে। এর মধ্যে উৎপীড়ক শ্রেণির অন্তর্লীন স্ববিরোধও লক্ষ করা যায়।

টুনটুনি আর রাজার কথা:

'টুনটুনি আর রাজার কথা' গল্পটি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই'এ (১৯১০) আছে। রাজার সিন্দুকের টাকাগুলি রোদে শুকোতে দেওয়া হয়েছিল। তুলে রাখার সময় একটি টাকা মাটিতে পড়ে যায়। টুনটুনি সেই টাকা পেয়ে নিজেকে বড়োলোক ভাবতে থাকে। রাজা যখন সভায় বসে আছেন, তখন টুনটুনি বাগানের এক কোণে গাছে বসে বলতে থাকে —

'রাজার ঘরে যে ধন আছে।
টুনির ঘরে সে ধন আছে।'

তখন রাজা টুনিকে ধরে আনার নির্দেশ দেয় এবং রান্না করতে বলে। কাটতে গিয়ে রানীর হাত থেকে টুনি পালিয়ে যায়। ভয়ে রানীরা রাজাকে ব্যাঙ ভাজা খাওয়ালে টুনটুনি বলে ওঠে —

'বড় মজা, বড় মজা,
রাজা খেলেন ব্যাঙ ভাজা!'

রাজা মশাই রানীদের নাক কাটার হুকুম দিলে, টুনটুনির বড়ো আনন্দ হলো এবং বলে উঠল —

'এক টুনিতে টুনটুনাল
সাত রানীর নাক কাটাল!'

রাজামশায় পুনরায় টুনিকে ধরে আনতে বললেন। ধরে আনা হলো। রাজা জলের সঙ্গে টুনটুনিকে গিলে খেয়ে নিলেন। 'অয়াক' করে ঢেঁকুর তুললেন। পেট থেকে বেরিয়ে টুনি উড়ে চলে গেল। সিপাই টুনিকে তরবারি দিয়ে কাটতে গিয়ে রাজার নাক কেটে ফেলল। টুনি তখন বলতে লাগল —

'নাক কাটা রাজা রে
দেখ তো কেমন সাজা রে।'

গল্পটি রূপকধর্মী। গল্পটিতে রাজশক্তির প্রতিভূ রাজার পরাজয় এবং দুর্বল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি টুনির জয় দেখানো হয়েছে। লোককথায় 'দুর্বলের জয়'একটি পরিচিত মোটিফ (Triumph of the weak – L 300)।

সাত ভাই চম্পা:

'সাত ভাই চম্পা' গল্পটি দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুমার ঝুলি' (১৯০৭) গ্রন্থে রয়েছে। 'ঠাকুমার ঝুলি' রূপকথার সংকলন। এক রাজার ছোটো রানীর সাত পুত্র ও এক কন্যাকে বড়ো ছয় রানী মিলে ছাইগাদায় পুঁতে রাখে। তারা সাতটি চাঁপা ও একটি পারুল গাছে রূপান্তরিত হয়। সাতটি চাঁপা গাছে সাতটি চাঁপা ও একটি পারুল গাছে একটি পারুল ফুল ফুটলে, রাজার মালি সেই ফুল তুলতে যায়। কিন্তু তুলতে পারে না। কারণ ফুলগুলি সঙ্গেসঙ্গে মালির হাতের নাগালের বাইরে চলে যায়। পরে রাজা

বড়ো ছয় রানীর ষড়যন্ত্র জানতে পেরে তাদের শাস্তি দেন। এই গল্পে ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির দ্বন্দ্ব বলতে ছোটো রানীর উপর অপর ছয় রানীর অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার দিকটি উদ্ঘাটিত হয়েছে।

২

ছড়া

ছড়া লোকসাহিত্যের একটি অন্যতম শাখা। ছড়াকে গ্রামীণ কবিতা বলা হয়েছে। ছড়ায় আমরা ব্যক্তি ও সমষ্টির দ্বন্দ্ব কীভাবে ধরা পড়েছে তা দেখা যেতে পারে। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া' গ্রন্থের 'তাঁতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা' ছড়াটির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে —

'তাঁতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা।
কোলা ব্যাঙের ছাঁ,
খায় দায়, গান গায় —
তাই রে — না রে না।
সুবুদ্ধি তাঁতির ছেলের কুবুদ্ধি ঘনাল,
আঁকাবাড়ি নিয়ে তাঁতি ব্যাঙের ছাঁ মারিল।
একটা ছিল কোলা ব্যাং বড়োই শেয়ানা,
লিখন পাঠায়ে দিল পরগনা পরগনা।
আজিডাঙ্গা কাজিডাঙ্গা মধ্যে ধনেখালি,
সেখান থেকে এল ব্যাং — চৌদ্দো হাজার ঢালি!
হুগলির শহরে ভাই, ব্যাঙের অভাব নাই,
সেখান থেকে এল ব্যাং — সনাতন সিপাই।
সুতানাতা নিয়ে তাঁতি যায় মণির হাটে,
একটা ছিল কোলা ব্যাং আগুলিল পথে।
সুতানাতা নিয়ে তাঁতি উঠল গিয়ে ডালে,
একটা ছিল কোলা ব্যাং থাপ্পড় দিল গালে।
সুতানাতা নিয়ে তাঁতি নাবল গিয়ে ভুঁয়ে,
একটা ছিল কোলা ব্যাং মারল লাথি মুয়ে!
ব্যাঙের লাথি খেয়ে তাঁতি যায় গড়াগড়ি,
চৌদ্দো হাজার ব্যাং উঠিল পিঠের উপর চড়ি।
পায়ের চাপে বোকা তাঁতি করে হাইফাই,
না মারো, না মারো, মোর তাঁতিরে গোঁসাই।'[১]

এই কৌতুকাশ্রিত ছড়াটির মধ্যে অত্যাচারী পুঁজিবাদী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি তাঁতির সঙ্গে খেটেখাওয়া শ্রমজীবী অত্যাচারিত মানুষের প্রতিনিধি ব্যাঙের দ্বন্দ্বকে রূপকের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে শ্রেণি সংগ্রামের পরিচয়। এই তত্ত্ব (Thesis) ও প্রতিতত্ত্বর (Antithesis) দ্বন্দ্বে তৈরি হয় সমন্বয়তত্ত্ব (Synthesis)। (Logic, Reasoning, Argument) এই ছড়াটিকে আমরা সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের এদেশের গরীব নিরীহ মানুষের উপর অত্যাচার, শোষণ, নিপীড়নের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ এবং প্রতিশোধের ঘটনার প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারি।

৩

প্রবাদ

প্রবাদ লোকায়ত মানুষের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত গদ্য রূপ। প্রবাদ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। প্রবাদ লোকায়ত মানুষকে শিক্ষা দেয়। রাজা রামমোহন রায় লর্ড বেন্টিঙ্কের সহায়তায় সতীদাহ প্রথা নিবারণ করলেও এই নিষ্ঠুর প্রথা আমাদের সমাজ থেকে নির্মূল হয়নি। প্রবাদে সেই চিত্র ধরা পড়েছে এভাবে —

'কার আগুনে কেবা মরে, আমি জাতে কলু।
মা আমার কি পুণ্যবতী বলছে দে উলু।।'

সহমৃতা করার সময় এক কন্যা চিতা থেকে পালালে অন্য একজনকে জোর করে চিতায় তুলে দেওয়া হয়। তখন সে এই কথা বলে। তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা অনুষ্ঠিত এই নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে অসহায় নারীর তীব্র ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ব্যঙ্গ সূচিত হয়েছে উপরিউক্ত প্রবাদে। অন্য একটি প্রবাদে পাই —

'পুড়ল মেয়ে উড়ল ছাই,
তবে তার গুণ গাই।'

প্রবাদের মধ্যে আমাদের সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র ধরা পড়েছে —

'কেউ মারে মশা, কেউ খায় শসা।'

কিংবা

'কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় কই।'

এর মূলে রয়েছে উৎপাদন ব্যবস্থা ও বন্টন ব্যবস্থার মধ্যে বৈষম্য। এই বৈষম্য আমাদের সমাজে চিরদিন ছিল, আছে এবং থাকবে, আমরা যতই সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদের কথা বলি না কেন এখানে ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির যে দ্বন্দ্ব তা অর্থনৈতিক বৈষম্যজনিত কারণে দ্বন্দ্ব। অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র একটি ছড়ায় ধরা পড়েছে এভাবে —

'আয় ঘুম আয় ঘুম বাগদি পাড়া দিয়ে,
বাগদিদের ছেলে ঘুমায় জাল মুড়ি দিয়ে।'

বাগদিদের ছেলে জাল মুড়ি দিয়ে ঘুমানোর মধ্যে অন্তঃসারশূন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৪

লোকসংগীত

লোকসংগীতকে আমরা লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি আবার অভিকরণমূলক শিল্পের (Performing Art) মধ্যেও ফেলতে পারি। লোকসংগীতের গানের সাহিত্যমূল্য যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে অভিকরণ মূল্য। বাংলার লোকসংগীত যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ তেমনি শিল্পগুণে সমৃদ্ধ। আমরা লোকসংগীতের দুই একটি ধারা থেকে দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে কালের প্রবহমান ধারায় ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির দ্বন্দ্বকে তুলে ধরতে পারি।

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার উল্লেখযোগ্য লোকসংগীত হলো ভাদু, টুসু ও ঝুমুর। এই গানে ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির দ্বন্দ্বের নানা মাত্রা লক্ষ করা যায়। দীর্ঘকাল ধরে আমাদের দেশে একটি সমস্যা চলে আসছে, তা হলো ত্রাণ বা র‍্যাশন (ration) নিয়ে দুর্নীতি। সাধারণ দরিদ্র মানুষ সাহায্য পায় না অথচ মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ রাতারাতি বড়োলোক হয়ে যায়। একটি **ভাদু** গানে তাই বলা হয়েছে —

‘ভাদু মা, গম বিলি করে
কেন মোরা পাইনা রিলিফ,
ভালোলোকের পেট ভরে,
ওগো মা জননী তেলা মাথায় তেল পড়ে।’

এভাবে ত্রাণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ সরব হয়েছেন। এই সমস্যা আমাদের দেশে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে।

কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর জন্য সাধারণ মানুষের জীবন কীভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে, তার দৃষ্টান্ত মেলে একটি টুসু গানে। কারণ তাঁরা অতিরিক্ত মুনাফার লোভে খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল মেশান। এতে অসংখ্য মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন এমনকি মৃত্যুমুখে পতিত হন। একটি **টুসু** গানে তাই বলা হয়েছে —

‘খাবারে ভেজাল, ওষুধে ভেজাল।
মানুষ বাঁচার হবে কি হাল।।
দুধে ভেজাল তেলে ভেজাল, জলে হইল ভেজাল।
জিনিস পত্রের মূল্যবাড়ি হইল আকাশ পাতাল।।
এভাবে চলিলে দেশ যাবে চলি পরকাল।
দুর্ভিক্ষ মহামারী রইয়ে যাবে চিরকাল।।’

এই গানগুলি আজ থেকে বহুবছর পূর্বে রচিত ও সংগৃহীত হলেও বর্তমান সময়েও গানগুলির প্রাসঙ্গিকতা শেষ হয়ে যায়নি। আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, এই সমস্যা আমাদের সমাজে দীর্ঘদিন ধরে চলমান।

প্রেমের ক্ষেত্রে লোকায়ত সমাজে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লক্ষ করা যায় একটি **ঝুমুর** গানে তা ধরা পড়েছে। কোনো অপরিচিত তরুণী দেখলে আমাদের সমাজের তরুণ সম্প্রদায় ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করতে ছাড়ে না। একটি দাঁড়শালি বা দাঁড়ঝুমুর গানে এক তরুণীকে দেখে ছোক্‌রা ছেলেরা কণ্ঠ ছেড়েছে জোরে —

‘শুকনা গাছেতে ফুটেছে ফুল
বঁধু কেমনে তুলিব ডালিমের-ই ফুল
তুলিতে তুলিতে হলো সকাল;
বঁধু কেমনে তুলিব ডালিমেরি ফুল।’

এর উত্তরে কিশোরীটি বলে উঠেছে —

‘আম গাছে আম নাই ঢিল কেন ছুঁড় হে,
তোমার দেশের আমি লহি —আঁখি কেন ঠার হে।’[২]

প্রেমের ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত বাস্তব সম্মত এবং লোকায়ত সমাজের ক্ষেত্রে ঘটমান সত্য।

৫
গীতিকা

প্রাক্-আধুনিক যুগের ধর্মভাবনা মুক্ত সাহিত্যধারা হলো গীতিকা বা Ballad। যদিও পাশ্চাত্যের ব্যালাডের সঙ্গে বাংলা গীতিকার সাদৃশ্যের পাশাপাশি নানা বৈসাদৃশ্যও যথেষ্ট রয়েছে। আমরা জানি দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম ‘ময়মনসিংহ গীতিকা’ (১৯২৩) নামে প্রকাশিত হয়। ‘ময়মনসিংহ গীতিকা’ একটি উল্লেখযোগ্য পালা হলো ‘মহুয়া’। এই ‘মহুয়া’ গীতিকায় দেখা যায় মহুয়া তার পালক পিতা এবং দলের প্রধান হুমরা বেদের আদেশ প্রত্যাখ্যান করে নদ্যার ঠাকুরকে ভালোবেসে তার সঙ্গে অরণ্যের মধ্যে পালিয়ে গেছে। বিবাহের ক্ষেত্রে বেদের দলের যে নিয়ম, তা মহুয়া অগ্রাহ্য করেছে। হুমরা, মহুয়াকে সুজন

বাদিয়ার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব দিলে মহুয়া সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রাক্-আধুনিক যুগে বাঙালি সমাজে এই ঘটনা অভাবনীয়। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের অনেক পূর্বেই নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ ঘটেছে। আমরা ময়মনসিংহ গীতিকায় এভাবে ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির দ্বন্দ্বকে লক্ষ করতে পারি।

সবশেষে বলি, শিষ্ট বা পরিশীলিত সাহিত্যের (Urban Literature) পাশাপাশি লোকসাহিত্যেও প্রবহমানকাল ধরে নানা টানা-পোড়েন, ঘটনার অভিঘাত যেমন লক্ষ করা যায় তেমনি ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, সামাজিক দ্বন্দ্বের পাশাপাশি ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির দ্বন্দ্বের নানা চিত্রও লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ধরা পড়েছে। কোনো তত্ত্বের দ্বারা ভারাক্রান্ত না করে খুব সহজেই এই সত্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। দুই একটি করে দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি দেখানোর চেষ্টা করা হলো।

সূত্র নির্দেশ:

১। 'খুকুমণির ছড়া', যোগীন্দ্রনাথ সরকার, পাতাবাহার, প্রথম পাতাবাহার সংস্করণ আশ্বিন ১৪২০, ৩১ সংখ্যক ছড়া, পৃষ্ঠা ২১-২৫।

২। 'সীমান্ত বাংলার লোকযান', সুধীরকুমার করণ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ পৌষ ১৪০২, পৃষ্ঠা ২২৪।

লেখক পরিচিতি:

ড. মিলনকান্তি বিশ্বাস: অধ্যাপক বাংলা বিভাগ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। পশ্চিমবঙ্গ বাউল আকাদেমির প্রাক্তন সভাপতি। রচিত গ্রন্থ 'প্রসঙ্গ : লোকসংস্কৃতি' (২০১৪), 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও বাংলার লোকসংস্কৃতি' (২০১৪), 'অগ্রন্থিত অদ্বৈত মল্লবর্মণ' (২০১৬), সাহিত্য অকাদেমি থেকে প্রকাশিত 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ : স্রষ্টা ও সৃষ্টি' (২০১৭)। বিভিন্ন গ্রন্থে ও পত্র-পত্রিকায় ষাটের বেশি প্রবন্ধ প্রকাশিত।